# লোককথা

শ্যামপদ মণ্ডল

[গ্রামবাংলার লোকসমাজে একদা লোকগল্প বা কাহিনির অপার সমাদর ছিল। সেই হারিয়ে যাওয়া সমাজের বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের একটি গল্প নদিয়া হরিণঘাটা জনপদের মধু দাস এবং দ্বিতীয় গল্পটি অধীর মণ্ডলের কাছ থেকে সংগৃহীত।]

## ১। সততার জয়

এক বামন এক শিষ্যের বাড়ি এসেছিল। দুদিন থেকে সেই একই পথে বামন বাড়ি ফিরছিল। বামনের খুব জল তেষ্টা পেল। পথের ধারেই পুরনো একটা ইঁদারা। বামন সেই ইঁদারায় উঁকি দিয়ে দেখল, জল অনেক তলায়। অনেক কষ্টে বামন সেই ইঁদারায় নেমে তেষ্টা মেটালো বটে, কিন্তু শত চেষ্টাতেও উঠতে আর পারে না। ঐ পথে এসে এক বাঘও তৃষ্ণার্ত হয়ে সেই ইঁদারায় নেমে জল খেল। কিন্তু সেও আর উঠতে পারলো না। কিছুক্ষণ পর এক সাপও তৃষ্ণার্ত হয়ে ঐ ইঁদারায় নেমে জল খেল। সেও আর উঠতে পারে না। অথচ বামন, বাঘ আর সাপ কেউ কাউকে মারছে না, সব মিলেমিশেই রইল।

একজন পথিক ঐ পথে যাচ্ছিল। সে চিৎকার শুনে ইঁদারায় উঁকি দিল। বামন , বাঘ আর সাপ চেঁচিয়ে উঠল, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। পথিক তো দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিল। ওদের চিৎকার শুনে আবার ইঁদারায় উঁকি দিল। পথিক চিন্তা করল, কি করা যায়।

পথিকের কাঁধে গামছা, পরনে কাপড়। বুদ্ধি ক'রে পথিক গামছাটা প'রে পরনের কাপড়টার এক প্রান্ত হাতে ধ'রে অপর প্রান্ত ইঁদারায় নামিয়ে দিল। সেই কাপড় ধ'রে প্রথমে বামন উঠে এল। তারপর পথিককে কিছু না ব'লে হেঁটে চ'লে গেল। এরপর উঠে এল বাঘ। যাবার সময় পথিককে বাঘ বলল, যদি কখনো কোথাও বিপদে পড়, আমায় স্মরণ ক'রো, সাহায্য করবো। তারপর সাপও উঠে এসে যাবার সময় পথিককে বলল, বিপদে স্মরণ করো, আসবো।

পথিক হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে। তার মনের ইচ্ছা তীর্থ ক'রে ফিরবে। সেই মন নিয়েই সে বাড়ি থেকে বার হয়েছে। যেতে যেতে সামনে পড়ল বন। বনপথে হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যা নামল। ক'টা বাঘ সেই পথিককে ঘিরে ফেলল। বিপদ বুঝে পথিক সেই বাঘকে স্মরণ করল। বাঘ এসে, পথিককে ঘিরে থাকা বাঘ ক'টাকে বলল, এই পথিক আমায় মরণ থেকে বাঁচিয়েছ। তোমরা আমার বাসায় নিয়ে যাও। আমি এই অতিথিসেবার জন্য খাবার নিয়ে, একটু পরেই ফিরছি। সে রাতে পথিকের ভাল খাওয়াদাওয়া হল। বাঘেরা লতপাতা বিছিয়ে সুন্দর গদি ক'রে অতিথিকে শুতে দিল। সকালবেলা অতিথিকে বাঘরাজা বলল, সেদিন ইঁদারা থেকে আমায় উদ্ধার করেছিলে, আমার সামান্য উপহার তোমায় নিতে হবে, একটু দাঁড়াও। অন্যান্য বাঘকে বাঘরাজা বলে দিল, যাও রাজার মেয়ে যখন পথে বেড়াতে বার হবে, তখন গলার গজমতির হারটা ছিনিয়ে নিয়ে চ'লে আসবে। তাই হল সেভাবেই হার এল।

সেই হার ঝোলায় নিয়ে পথিক তো আবার হাঁটতে থাকল। যেতে যেতে সেই উদ্ধার করা বামনের সঙ্গে দেখা। বামন তো মহা খাতির ক'রে পথিককে বাড়ি নিয়ে গেল, দুপুরে দুটো সেবা করতেই হবে। পথিক তখন কাঁধের ঝোলাটা বামনের ঘরের চালের বাতায় ঝুলিয়ে রেখে নদীতে স্নান করতে গেল। এই সময় বামন ভাবল, দেখি তো ঝোলায় কি! দেখতে গিয়ে ঝোলায় মিললো সেই গজমতির হার। মনে পড়ল রাজার ঘোষণার কথা, যে আমার মেয়ের গজমতির হারের সন্ধান দিতে পারবে, তাকে বহুমূল্য উপহারে ভূষিত করা হবে। তখনি বামনের মাধ্যমে সংবাদ পৌঁছে গেল রাজার কানে। পথিক স্নান করে, ফিরছে, এমতাবস্থায় রাজার লোক এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। বামনতো প্রচুর উপহার পেয়ে মহাখুশি। ওদিকে পথিক আছে রাজার কারাগারে বন্দি। রাত্রে পথিক সেই উদ্ধার করা সাপকে স্মরণ করল। সাপ কারাগারে ঢুকে পথিকের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনল। তারপর বলল, আমি এই রাতে রাজকন্যাকে দংশন করবো, ওঝা-কবিরাজ কেউ বাঁচিয়ে তুলতে পারবে না, সাতদিনের দিন তুমি যাবে। তাই হল। রাজা ঘোষণা করলেন, যে আমার মেয়েকে বাঁচাতে পারবে, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ও অর্ধেক সম্পত্তি দেব। ওঝা-কবিরাজ সব ফেরৎ গেল। শেষে বন্দি পথিক আগ্রহ প্রকাশ করলে, তাকে ডাকা হল।

নির্জন বদ্ধ ঘরে এককড়া গরম দুধ আনা হলে সাপ এসে রাজকন্যার গা থেকে শুষে

বিষ তুলে সেই দুধের কড়ায় ছাড়তেই দুধ নীল হয়ে গেল। এরপরে সাপ বাইরে চলে গেল। পথিক তখন দশের সামনে বাঘ আর সাপকে স্মরণ করল। বাঘ ও সাপ এসে সব ঘটনা বলল। রাজা তখন সেই বামনকে এনে গর্দান দিলেন। যথাসময়ে পথিকবরের সঙ্গে রাজা নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

**মন্তব্য :** মানুষ অপেক্ষা বন্য হিংস্র প্রাণীও যে অনেকসময় ভালো হতে পারে এ কথায় তা ঘটেছে। অনেক লোককথাতেই গুরুশিষ্য প্রসঙ্গ মেলে। গুরু বা গোঁসাইদের ভণ্ডামির মুখোশ এই লোককথায় শেষে খুলে গেছে। বিপদ থেকে উদ্ধার করা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা সত্যকে আঁকড়ে ধ'রে জীবনপথে চলা—এ লোককথায় বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায়। অনেক লোককথাতেই বামনকে লোভী হিসাবে দেখা যায়।

## ২। লক্ষ্মীপুরাণ

শিব কৈলাসে বসবাস করছেন। শিবের দুই মেয়ে দুই ছেলে। দুই ছেলে গণেশ আর কার্তিক ঘরে-বাইরে ঘোরাঘুরি করে, সময় কেটে যায়, কিন্তু মেয়ে দুটির অনেকটা একঘেয়ে জীবন। দিনরাত বাড়িতে থেকে ভালো লাগে না। মনমরা ভাব নিয়েই সময় কাটে। লক্ষ্মী আর সরস্বতী প্রায়ই বাবার কাছে আব্দার ধরে, একদিন বেড়াতে নিয়ে চলো। শিব বলে, দাঁড়া সময় বার করি। একদিন বার হব, মর্তে নিয়ে যাব বেড়াতে, ভালো লাগবে, আনন্দ পাবি, অনেক কিছু দেখতে পাবি— নদনদী, নানা ফুলপাখি, কত নামের পাহাড়পর্বত, বনজঙ্গল, চাষের জমি, মানুষ, বিভিন্ন নামের পশু, ঘরবাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। একদিন যেতেই হবে।

সময় আর হয়না, সময় আর হয়না। শিব তো ভিক্ষা করে সংসার চালায়। সব সময় বাড়িও থাকে না। বার হয় তো বারই হয়, আপনভোলা শিব, কখন কোথায় থাকে ঠিক কেউ বলতে পারে না। মাঝে মাঝে বাড়ি আসে, ঝোলায় বেশি চালও পড়ে না। মাঝে মাঝেই চালের লোভে রাতে গণেশের ইঁদুরে সেই ঝোলা দেয় কেটে। অভাবের সংসার—ঝামেলার যেন শেষ নেই। একদিন সময় হল। দুই মেয়েকে ডেকে শিব বললে, রেডি হয়ে নাও—বেড়াতে নিয়ে যাব আজ মর্তে।

দুই মেয়ে লক্ষ্মী আর সরস্বতীকে নিয়ে শিব মর্তে নেমে এল। মর্তের সৌন্দর্যে দুই বোনের মহা আনন্দ, দুচোখ ভরে শুধু দেখছে আর দেখছে। শিব বলল, প্রথমেই বলে রাখি—সব দেখবে শুনবে মনে রাখবে বুঝবে, কোনো ক্ষতি করবে না, কোনো গাছের ফুলপাতা ফল ছিঁড়বে না, ডাল ভাঙবে না। ঐ দ্যাখো নদী, ওটা অরণ্য, ওটা সমভূমি, ওটা চাষের ক্ষেত, এটা গ্রাম, ওটা অমুক পাহাড়, তমুক পর্বত, ওটা সমুদ্র ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুই মেয়েকে নিয়ে শিব হাঁটছে নানা শস্যক্ষেতের পাশ দিয়ে। এবার এল সর্ষেক্ষেত।

তা দেখে লক্ষ্মীর তো আনন্দ আর ধরে না। লক্ষ্মীর তো ভালো লাগবেই, সে যে শস্যের দেবী। সর্ষের কী সুন্দর সুন্দর ফল, কী সুন্দর গাছ, কী সুন্দর চোখ আলো করা ফুল। থাকতে না পেরে সর্ষেফুলের একটি পাপড়ি ছিঁড়ে হাতে নিল লক্ষ্মী। লুকিয়ে রাখছে, বাবা যেন দেখতে না পায়। কিন্তু শিব তো অন্তর্যামী, সব জানে সব বোঝে। শিব রেগে গিয়ে লক্ষ্মীকে বলল, তুমি চাষির জমি থেকে এই ফুলের পাপড়ি ছিঁড়লে কেন? ফুল দেখার জন্য, ছিঁড়ে নষ্ট করার জন্য নয়। দেবদেবীরা পুজো পায় মাঠভরা ফলফুলের ডালায়, কেন নষ্ট করলে। তুমি আজ থেকে পাখি হয়ে এই সর্ষের জমি পাহারা দাও, এ তোমার বারো বছরের শাস্তি। এ তোমার ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। বারো বছর পর আমি এসে তোমাকে কৈলাসে স্বর্গে নিয়ে যাব, তুমি থাকো। আমি ঠিক আসবো—দেখা হবে।

শিব তখন লক্ষ্মীকে মর্তের শস্যক্ষেতে রেখে সরস্বতীকে নিয়ে কৈলাসে ফিরে গেল। লক্ষ্মী সেই থেকে পাখি হয়ে চাষির সর্ষের জমিতে পাহারার কাজে বহাল হল। পরদিন সকালে জমির মালিক সর্ষেক্ষেত দেখতে এসে দেখলো, একটা সুন্দর পাখি সর্ষের জমিতে সর্ষে গাছে আছে। 'হেই হেই' করলে পাখিটা উড়ে উড়ে স'রে স'রে বসে, জমি ছেড়ে তো যায় না। কী বিপদ, সর্ষের তো সব ক্ষতি করে দেবে। এই ভেবে চাষি বাড়ি গিয়ে তিরধনুক নিয়ে জমির আলে এলো। চাষি যত তির ছোঁড়ে, পাখি তো স'রে স'রে উড়ে বসে, জমি ছেড়ে যে যায়ই না। কী করা যায়। চাষি পড়ল মহা মুশকিলে, এমন বিপদ তো কখনো জীবনে আসেনি। জমি ছেড়ে যে পাখি যায় না। চাষি বাড়ি গিয়ে তিরধনুক রেখে চামবাটুল নিয়ে এবার এল জমির আলে। চাষি যতই গুলি ছোঁড়ে—ঐ একই অবস্থা, পাখি স'রে গিয়ে অদূরেই একই জমিতে সর্ষেগাছে বসে। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সব গুলি গেল ফুরিয়ে। ক্লান্ত চাষি বেগতিক দেখে বাড়ি ফিরে গেল। চাষির মন খুব খারাপ, চুপচাপ আছে। সন্ধ্যা হয়, রাত হয়, খেয়ে চাষি শুয়ে পড়ে—ঘুম তো আসে না। ঐ এক চিন্তা—পাখিটাকে কী করা যায়, কী করেই বা তাড়ানো যায়।

এমন যখন অবস্থা, চাষি ভাবছে—এখন পাখিটা কী করছে, নিশ্চয় ঘুমাচ্ছে—এ সময় যদি যাওয়া যায় জমিতে, তাহলে পাখিটাকে বুঝি ধরা যায়, তাহলে এখনই যাওয়া যাক। এই চিন্তা করে চাষি বাড়ি থেকে বার হয়ে একা একাই সেই সর্ষের জমিতে গিয়ে খুব সাবধানে পাখিটাকে খুঁজতে থাকলো। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাত, সব কিছুই দেখা যাচ্ছে—ঐ তো পাখিটা চুপচাপ বসে আছে, ঘুমাচ্ছে। দেখা যাক আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে ধরা যায় কি না। এ সুযোগ হাতছাড়া হলে সব বুদ্ধি শেষ, আর বুঝি কোনো উপায়ই থাকবে না।

পা টিপে টিপে চাষি অতি সাবধানে পাখির কাছাকাছি হয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে ধ'রে ফেলল। অতি যত্নে পাখিটাকে নিয়ে চাষি বাড়ি এল, এত সুন্দর পাখিটাকে পুষতেই হবে—একে ছাড়া যায় না। বাড়ি ছিল খাঁচা। সেই খাঁচায় সেই চাষি সুন্দর পাখিটাকে রেখে পুষতে থাকলো। পাখি কথা বলে, শিস দেয়, গান গায়।

এদিকে চাষির মাঠে প্রচুর ফসল। অন্য মাঠের অন্য চাষির ফসল অপেক্ষা তার জমিগুলির ফসল হয় সেরা, চাষি দামও পায় অন্যদের থেকে বেশি। আসলে পাখি তো লক্ষ্মী। লক্ষ্মী বাঁধা আছে চাষির বাড়ি। চাষির ভাগ্য তো ফিরবেই। আসলে লক্ষ্মীকে তো বেঁধে রাখা যায় না। চাষির কাছে লক্ষ্মী ধরা দিল। লক্ষ্মীপাখি একদিন সুযোগমত চাষিকে বলল, চাষিভাই—কোনোদিন কোনো পাখিকে বধ করবে না। কারে কোনো ক্ষতি করবে না, অন্যায় করবে না—এতে তোমার উপকার হবে, উন্নতি হবে—আমায় মারছিলে কেন?

চাষি সে দিন পাখির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। সেই থেকে পাখির কথামতই দিন অতিবাহিত করে, সংসার চালায়—পাখির নির্দেশ মত নিয়ম মেনে সৎভাবে চলে। সে চাষি আর আগের মত নেই। সমাজের সবাই চাষির খুব সুনাম করে। চাষির বৌটাও তেমনি ভদ্র, নিষ্ঠাবতী ও ভালোমনের অধিকারী। দেখতে দেখতে এই চাষিবাড়ির সুনাম অন্যান্য গ্রামসমাজেও ছড়িয়ে যায়।

এভাবেই দিন কাটতে থাকে। চাষে এখন চাষির খুব মন, ভোরবেলা মাঠে চ'লে যায়। চাষিবৌ প্রতিদিন মাঠে পান্তা দিয়ে আসে। সেই পান্তা খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে চাষি আবার কাজে লেগে যায়।

চাষি একদিন মাঠের পথে যেতে যেতে দেখলো, রাখালেরা গোরু চরাতে চরাতে একটা কচ্ছপ কুড়িয়ে পেয়ে কচ্ছপটাকে লাঠির বাড়ি মারছে আর বলছে— তোকে নাড়ার আগুনে পুড়িয়ে খাব। গোরু চড়ানো লাঠির বাড়ি খেয়ে কচ্ছপটা ক্রমে শক্তি হারিয়ে ফেলছে। এই নির্যাতনের দৃশ্য সইতে না পেরে সেই চাষি তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে রাখালদের বলল—এ কচ্ছপটার মাংস ভালো হবে না, এতো এতটুকু মাংস হবে। কচ্ছপটা আমার কাছে বেচে দাও, এই নাও নগদ পয়সা দিচ্ছি। বাজারে এ পয়সায় অনেক বেশি মাংস পাবে, এই নাও। রাখালেরা দেখলো এ সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। তাই চাষির হাত থেকে নগদ পয়সা পেয়ে কচ্ছপটা দিয়েই দিল। কচ্ছপটাকে গামছায় জড়িয়ে নিয়ে সেই চাষি মাঠের পথে এগিয়ে একটা জলাশয়ের ধারে ঝোপের মধ্যে চুপি চুপি ছেড়ে দিল। মিলিয়ে যেতে যেতে সেই কচ্ছপ চাষিকে বলল—তুমি আজ আমাকে যে উপকার করলে কোনোদিনও ভুলবো না। যদি জীবনে চলার পথে কখনো কোনো বিপদে পড়, যদি মনে পড়ে—আমাকে স্মরণ করো। সাধ্যমত চেষ্টা করবো তোমাকে উদ্ধার করতে।

লক্ষ্মীপাখির আশীর্বাদে সেই চাষিভাই এক মাঠের সব জমি কিনে ফেলল। কিন্তু মনে লোভ নেই, মানুষজন বিপাকে পড়লে সব সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে—সাধ্যমত অর্থসাহায্য করে।

তিন বছর পর সেই চাষি আর এক ঘটনার মুখোমুখি হল। সেদিনও চাষি মাঠে যাচ্ছে হেঁটে। দেখলো, পাড়ার কতগুলো ছেলে একটা কালো বিড়ালকে পিটিয়ে আধমারা করে পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নদীতে ফেলে দিতে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে চাষি

বলল, এমন করছো কেন, কী হয়েছে বলো? ছেলেরা বললো, পাড়ায় এই বিড়ালটা প্রতিদিন কোনো না কোনো বাড়ির রান্নাঘরে ঢুকে দুধ খেয়ে নেয়। তাই একে আধমারা করেছি, নদীতে ফেলে দিলেই মরে যাবে, আমরা হাতে ক'রে আর মারবো না। শুনে চাষি বলল, ও তাই? কষ্ট ক'রে নদী পর্যন্ত তোমাদের যেতে হবে না। আমি তো মাঠে যাচ্ছি—দাও আমাকে দাও, আমি মাঠের পথে যেতে যেতে দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে যাব। চাষির হাতে বিড়ালের দায়িত্ব ছেড়ে ছেলেরা নিস্তার পেল ও যার যার বাড়ি ফিরে গেল। ধারেকাছে কেউ নেই দেখে সেই চাষি তখন বিড়ালটাকে আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে নিয়ে দূরে ঝোড়ের কোলে ছেড়ে দিল। যেতে যেতে চাষি শুনতে পেল সেই বিড়াল বলছে—জীবনে চলার পথে যদি কখনো বিপদে পড়, স্মরণ করো, সাহায্য পাবে সাধ্যমত।

এদিকে দিন যায় মাস যায় বছর যায়—ভালোভাবেই চাষির দিন চলে যায়। সহায় সম্পদে তার কোনো অভাবই নেই। তিন বছর পর আর এক ঘটনা। চাষি যাচ্ছে মাঠে। যেতে যেতে দেখলো রাখালেরা মাঠের একজোড়া পায়রা ধরে নানাভাবে নির্যাতন করছে আর বলছে—নাড়ার আগুনে পুড়িয়ে খাব। কাছে গিয়ে চাষি বলল—এই নাও পয়সা, বাজার থেকে খরগোসের মাংস কিনে খেও, কারণ দুটো পায়রার থেকে একটা খরগোসে বেশি মাংস পাবে, পায়রার মাংস খেতে তত ভালো না, তাছাড়া হবেও তো মোটে এতটুকু মাংস, দাও দাও পায়রা দুটো আমায় দাও—এ দুটোর মাংসে তোমাদের কুলাবে না। রাখালেরাও ভাবলো—তাইতো, কতটুকুই বা মাংস হবে। শেষ পর্যন্ত নগদ পয়সায় তারা পায়রা দুটোকে চাষির হাতে বেচেই দিল। চাষিভাই সেই পায়রাদুটো মাঠে নিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিল। উড়ে যেতে যেতে পায়রা দুটো বলল— চাষিভাই, কখনো বিপদ এলে কিংবা প্রয়োজন পড়লে আমাদের স্মরণ নিও, আসবো।

চাষির তো দিন কেটেই যায়। লক্ষ্মীপাখির কৃপায় আজ তার কিছুরই অভাব পড়ে না। চাষি আর চাষিবৌ দুজনে মিলে পাখিটাকে খুব সেবাযত্ন করে। লক্ষ্মীপাখি এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় না। এইভাবে আরো তিন বছর যায়।

চাষি আবার মাঠের পথে হাঁটছে। মাঠে যেতে যেতে দেখলো—রাখালেরা দুটো ভ্রমর ধরে দুটো আলাদা পাতায় মুড়ে এ ওর কানের গোড়ায় ধরছে আর গান শুনছে। কাছে গিয়ে চাষি বলল, কই আমার হাতে দাও দেখি, গান হয় কিনা দেখি, দুটো ভ্রমরকে এক পাতায় মুড়ে কানের কাছে ধরলে গান নিশ্চয় আরো জোরে শোনা যাবে। এ কথা বলে চাষি তখন দুপাতার ভ্রমরদুটোকে এক পাতায় আনার ছল ক'রে ইচ্ছা ক'রে উড়িয়ে দিয়ে বলল—যা, উড়ে গেল। উড়ে যেতে যেতে ভ্রমরজোড়া বলল—বিপদের দিনে স্মরণ নিও, উপকার পাবে। রাখালরা ভাবলো, গান করতে করতে ভ্রমরদুটো উড়ে গেল। কিন্তু, চাষিই শুধু বুঝলো গুঞ্জনের ভাষা।

এইভাবে তিন বছর পর পর মোট চারটি ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলো সেই চাষিভাই।

দেখতে দেখতে কেটে গেল বারোটি বছর। শিব তো ভোলা—ভোলানাথ। আসলে শিব তো ভোলে না, ভুলে থাকে মাত্র। তাই বারো বছর পর ঠিক তার টনক নড়ল। যেতে হবে মর্তে লক্ষ্মীকে আনতে।

শিব তো যথারীতি মর্তে চাষির সেই নির্দিষ্ট জমিতে অবতীর্ণ হল। কিন্তু, কই লক্ষ্মী তো এখানে নেই। তবে কোথায় গেল, কেন গেল? খোঁজাখুঁজি ক'রে না পেয়ে শিব ভাবলো—দেখি যাই জমির মালিকের বাড়ি। জমির মালিক সেই চাষিভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে শিব দেখে—খাঁচায় আছে পাখির বেশে লক্ষ্মী। খাঁচায় কেন? লক্ষ্মীপাখি বলল, আমি তো এমনি আসিনি, চাষিভাই আমাকে জমি থেকে এনেছে। সেই থেকে আমি স্বেচ্ছায় খাঁচায় আছি। চাষিকে লক্ষ্মীপাখি খাঁচার দরজাটা খুলে দিতে বলল। চাষিভাই দরজা খুলে দিতেই খাঁচা থেকে বেড়িয়ে এসে লক্ষ্মীপাখি স্বমূর্তি ধারণ ক'রে বলল—বাবা, আমি বারো বছর এই চাষির ঘর করছি, তাই এই চাষিকেও আমাদের সঙ্গী করতে হবে—আমাদের সঙ্গেই তার স্বর্গবাস হবে। আমার যে চাষির প্রতি মায়া পড়ে গেছে বাবা!

শিব তো সব জেনেশুনে শেষে বলল—হ্যাঁ ও যেতে পারে, তবে ওতো মানুষ, ওকে হেঁটে যেতে হবে, আমরা তো যাবো উড়ে। ও যে যাবে—ওকে তাই পরীক্ষা দিতে হবে। ওর পরীক্ষা নেব মোট চারটে, তাতে যদি ও পাস করতে পারে, তবেই স্বর্গবাসী হতে পারবে। প্রথম পরীক্ষা ওর হবে হেঁটে নদী পার হওয়ার।

চাষির বাড়ির সামনে দিয়েই বয়ে চলেছে কুলুকুলু রবে এক নদী। কোনো সেতু নেই, অথচ চাষিকে নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে ওপারে যেতে হবে। নদীর ধারে গিয়ে চাষির মনে পড়ে গেল—বিপদে পড়লে কচ্ছপকে স্মরণ করবার কথা। কচ্ছপকে স্মরণ করতেই লক্ষ লক্ষ কচ্ছপ জলের উপরে ভেসে উঠল, অমনি তৈরি হয়ে গেল ওপারে যাবার লম্বা-চওড়া রাস্তা। চাষিতো খুব সহজেই ওপারে হেঁটে গিয়ে, হেঁটে আবার এপারে চ'লে এলো। এভাবে প্রথম পরীক্ষায় চাষি পাস হয়ে গেল। এবার দ্বিতীয় পরীক্ষা। শিব এবার দুধভর্তি একশটা বাটি সামনে রেখে চাষিকে দেখিয়ে বলল—কোন্ বাটির দুধে বিষ মেশানো আছে, তো তোমাকে বলতে হবে। এবার চাষির মনে প'ড়ে গেল, বিপদে পড়লে বিড়াল বলেছিল স্মরণ করতে। তাই সেই চাষি বিড়ালকে স্মরণ করতেই, কোথা থেকে সেই কালো বিড়াল এসে সেখানে হাজির হল। সেই বিড়াল প্রতিটি দুধভর্তি বাটির কাছে গিয়ে গন্ধ পরখ করতে লাগল। একটি বাটি ছেড়ে আর একটি বাটি হয়ে এগোতে এগোতে এবার একটি বাটির কাছে মুখ নিয়ে ম্যাঁও ম্যাঁও করতে থাকল। চাষি এবার সেই বাটিটি নিয়ে শিবের হাতে তুলে দিয়ে বলল, এই বাটিটাতেই বিষ আছে। শিব বুঝল, এ পরীক্ষাতেও চাষি পাস হয়ে গেল।

এবার তৃতীয় পরীক্ষা। এক ধামা সর্ষে উঠোনে ছড়িয়ে দিয়ে চাষিকে শিব বলল, কোন্ সর্ষেটাতে লক্ষ্মী লুকিয়ে আছে, তার বার করে দিতে হবে। চাষির সামনে এল নতুন সমস্যা।

এই বিপদের মুখে চাষি পড়ল মহা চিন্তায়, কী করা যায়, এখন কী হবে। চাষির মনে পড়ে গেল পায়রাজোড়ের কথা, ওরা উড়ে যাবার কালে বলেছিল—বিপাকে পড়লে স্মরণ করতে। চাষি তখন পায়রাজোড়াকে স্মরণ করতেই, তারা আকাশপথে উড়ে এসে উঠোনে বসল। পায়রাদুটি পরস্পরে কিছু বলাবলি ক'রে নিয়ে লক্ষ্মীসর্ষে খোঁজায় মন দিল। খোঁজাখুঁজি করতে করতে তারা লক্ষ্মীসর্ষেটি আবিষ্কার করল। পুরুষ পায়রাটি সেটি ঠোঁটে ক'রে তুলে নিয়ে চাষির হাতে দিল। চাষি সেই সর্ষে আবার শিবের হাতে তুলে দিলে শিব বুঝল, এক্ষেত্রেও চাষি পাস হল।

চাষির সামনে এবার হাজির চতুর্থ পরীক্ষা। এবার শিব নদীতটের পদ্মবন দেখিয়ে চাষিকে বলল, কোন্ পদ্মটিতে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান অর্থাৎ কোন্ পদ্মটি লক্ষ্মীপদ্ম, তা দেখাতে হবে। চাষি তো পড়ল আবার মহা বিপদে, মহা সমস্যায়। মনে পড়ল, ভ্রমরজোড়া উড়ে যেতে যেতে বলেছিল বিপদে পড়লে স্মরণ করতে। চাষি তখন একমনে ভ্রমরজোড়াকে স্মরণ করতে, তারা এসে পড়ল। তারপর পরস্পরে গুঞ্জনের মাধ্যমে কথা বলাবলি সেরে নিল। এরপর ভ্রমরদুটি পদ্মবনে ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াতে লাগল। এক সময় দেখা গেল কোনো একটি পদ্মের ওপর ওরা উড়ে উড়ে ঘুরে-ঘুরে গুঞ্জন করতে লাগলো। চাষি তখন সেই পদ্মটি শিবকে দেখিয়ে বলল, ঐ পদ্মটিতে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান—ওটা লক্ষ্মীপদ্ম। শিব বুঝল, চার পরীক্ষাতেই চাষি পাস হয়ে গেল।

শিব এবার চাষিকে নিতে সম্মত হল। শিব লক্ষ্মী ও চাষি স্বর্গে গেল। এভাবেই চাষির ভাগ্যে হল স্বর্গবাস, এভাবেই চাষি হল উদ্ধার।❑

**মন্তব্য:** লোককথা, স্বর্গ থেকে সে কথা মর্তে নেমে এসেছে। সংসারের প্রতি শিবের যে টান এবং সে টান থেকে কন্যাদ্বয় লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে মর্তে নিয়ে আসা—চাষের জমি দেখানো—লক্ষ্মী কর্তৃক সর্ষের পাপড়ি ছেঁড়া এবং তা থেকে চাষির বাড়ি তার থাকা, চাষিকে সুবুদ্ধি দেওয়া বা সৎ পথে চালিত করা ইত্যাদি অভিপ্রায়ে দাঁড়িয়েছে। তিন বছর পরপর চাষির জীবনে এক একটা ঘটনার সম্মুখীন হওয়া, বিভিন্ন প্রাণীকে রক্ষা করা—আবার তাদের মাধ্যমেই শেষের বিপদগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া—সবই অভিপ্রায়। মঙ্গলকাব্যে যেমন দেখি শাপমুক্তির পরে স্বর্গে ফিরে যাওয়া—এ গল্পেও লক্ষ্মী ও চাষির ক্ষেত্রে তা ঘটেছে। শিবায়নে শিব চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত দেখি। এ গল্পেও শিবের পক্ষে চাষের জমি ও চাষ বোঝা ব্যাপারটা যে সহজ, তা বোঝা যায়। কীটপতঙ্গ পাখি ও অন্যান্য জীবকুলও যে কতটা সৎ ও সরল হতে পারে, এ গল্পে তাও মেলে।